শেষ মোগল সম্রাট পরিবারের করুণ কাহিনী

ইতিহাসের কান্না

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

শেষ মোগল সম্রাট পরিবারের করুণ কাহিনী

ইতিহাসের কান্না

রূপান্তর ও সম্পাদনা

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন
ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

ইতিহাসের কান্না

মূল	মুসাব্বিরে ফিৎরত খাজা হাসান নিজামী
রূপান্তর ও সম্পাদনা	মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
রাহনুমা প্রথম প্রকাশ	জুন ২০১৬
প্রকাশনা সংখ্যা	৫৫
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৩/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ: ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১২০.০০ (একশ বিশ টাকা মাত্র)

ETIHAS ER KANNA
Written by : Khaza Hassan Nizami, Translated by : Mawlana Ubaidur Rahman Khan Nadwi
Marketed & Published by : Rahnuma Prokashoni. Price : Tk.120.00, US $ 8.00 only.

ISBN: 978-984-92211-4-2
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com

অর্পণ

ফারহাত জাহান সানিয়া

আমার কোনো বই বেরুলে সবার আগে বইটি
যে পড়ে ফেলে এবং
যার সরল ধারণায়—তার বড় মামা মস্ত বড়
এক লেখক।

ইতিহাসের কান্নার লেখক

দিল্লির অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা খাজা হাসান নিজামী ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৫ সালে। তিনি ৫০০-এর বেশি বই লিখেছেন। উর্দুভাষী এ লেখকের ভাষাশৈলী অদ্বিতীয়। দিল্লির চলিত ভাষায় তাঁর বর্ণনাধর্মী লেখা পাঠকের অন্তরে গভীর ছাপ রেখে যায়। অবস্থার চিত্রায়ণ বা প্রকৃতির প্রতিচ্ছবিতে দক্ষতার জন্যে তাঁকে 'মুসাব্বিরে ফিৎরত' বলা হয়।

খাজা হাজান নিজামীর শৈশব কাটে দিল্লির ক্ষমতাচ্যুত উৎপীড়িত তৈমুর বংশীয় শাহজাদাদের সাথে, যারা লাল কেল্লার প্রাসাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজামুদ্দীন বস্তিতে জীবন কাটাচ্ছিলেন। যুগের চাকায় নিপিষ্ট, নিয়তির নির্মম পরিহাসে নিষ্পেষিত এ ভাগ্যাহতদের সান্নিধ্য তাঁকে ভীষণ আবেগাপ্লুত করে। তিনি তাঁদের অবস্থা দেখে-শুনে অনেকগুলো বই লেখেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বই *বেগমাত কে আঁসু* বা *রাজমহীষীদের অশ্রুধারায়* ১৮৫৭ সালের অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। সে বই থেকেই কয়েকটি পর্ব এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

খাজা নিজামীর এ বইটি বৃটিশ আমলে কয়েকবার বাজেয়াপ্ত হয়। অতঃপর ভারত স্বাধীন হলে এর অগণিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে এ বইয়ের এই প্রথম প্রকাশ। অবশ্য *দৈনিক ইনকিলাবে* ধারাবাহিকভাবে এর কয়েকটি পর্ব ইতোপূর্বে ছাপা হয়। ধীরে ধীরে খাজা হাসান নিজামীর আরও বই প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রয়েছে।

-প্রথম প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

বৃহত্তর ময়মনসিংহের এক প্রতাপশালী জমিদারপুত্র—যিনি আমার মরহুম দাদাসাহেবের (১৯০৪-১৯৮২ খ্রি.) খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন—একবার আমাদের বাসায় এলেন। কান্তিময় চেহারা, শিষ্ট আচরণ আর দর্শনীয় আদব-লেহাজ। দাদাসাহেবকে পা ছুঁয়ে সালাম করলেন, হাতে চুমো খেয়ে হালাবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। কথাবার্তা সেরে কিছুক্ষণ পর চলেও গেলেন। পরে দাদাসাহেব আমাদের এ জমিদারপুত্রের জীবন-ইতিহাস শুনিয়েছিলেন।

এরপর থেকে যখনই তিনি দাদাসাহেবের সাথে দেখা করতে আসতেন, আমরা একটু সচকিত হয়ে উঠতাম। তাঁকে দেখতাম, তাঁর কথাবার্তা লক্ষ করে শুনতাম। অতীত দিনের স্মৃতি, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয়েই কথা চলত। একদিন হয়তো বলতেন, 'আমাদের তৈজসপত্র সবই শেষ।' কোনোদিন বলতেন, 'সীমানা প্রাচীরের ইটগুলোও বিক্রি করা হয়েছে।' একদিন বলতেন, 'আমার গলার এ রূপার মাদুলি ছাড়া আমার আর কোনো সম্পদই নেই।'

সব সময়ই আমরা লক্ষ করতাম দাদাসাহেব এ জমিদার-তনয়কে খুব স্নেহ করতেন। খুব সহজ ভঙ্গিতে তাঁর পকেটে কিছু টাকা পয়সা ভরে দিতেন। একদিন এ মেহমানকে বিদায় করে দাদাসাহেব বাংলা ঘর থেকে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। খুব অনুভূতিপ্রবণ সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তি তিনি; এর ওপর উচ্চ রক্তচাপের রোগী। আমার আম্মাকে ডেকে বললেন, 'বৌ মা, ... কে আজ যাকাতের টাকা দিলাম। সে বলল, "যার তার কাছে তো আর আমাদের দুরবস্থার কথা বলতে পারি না।" ভাবছি তাদের সম্মান

হানি না হয় এমন কিছু উৎস থেকে তাকে কিছু সাহায্য করা যায় কিনা!' এরপর এ জমিদার পরিবারের অতীতপ্রসঙ্গে কিছু কথা বলে, এদের বর্তমান কষ্টের বিষয়েও বললেন। বললেন, 'ধনী মানুষ দরিদ্র হলে ভীষণ কষ্ট। আর সব সময়ই যারা অভাবী তাদের কাছে দারিদ্র্যের অনুভূতিটা তেমন প্রকট হয় না, যেমন হঠাৎ অভাবে পড়া ধনীদের কাছে হয়।'

তখন থেকেই এসব আমাকে খুব ভাবিত ও ভারাক্রান্ত করত। বড় হয়ে যখন লেখালেখির লাইনে এলাম তখন বহু ভেবেছি, এসব মানুষের বিপর্যয়ের ইতিহাস লিখব কি না। এসব ঘটনায় তো মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে।

এর অনেক পর আমি দিল্লি ভ্রমণে যাই। প্রথমবারের মতো আমাকে দিল্লির পুরোনো এলাকাগুলো ঘুরিয়ে দেখান দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা সিরাজুল হক সাহেব। আজ আর তিনি ইহলোকে নেই। সিরাজ সাহেবের সাথে যখন দিল্লির বিখ্যাত জামে মসজিদ দেখে ঐতিহাসিক লালকেল্লায় প্রবেশ করছি, তখন আমার মনে দ্রুত ভাবান্তর ঘটছে। বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) সন্তানরা কী দাপটের সাথেই না শাসন করে গেছে আসমুদ্র হিমাচল এ ভূখণ্ড। গোটা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, উত্তর ভারত জুড়ে হুমায়ুন আর সর্বভারতীয় মোগল সাম্রাজ্যে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের উত্তাপ যেন আজও অনুভব করেন ইতিহাসমনা মানুষেরা। আগ্রা-ফতেহপুর আর দিল্লির পুরাকীর্তিগুলোই তো আজ ইতিহাসের এ অসাধারণ চরিত্রসমূহের স্মারকরূপে দাঁড়িয়ে।

রাজকীয়তার সকল ধারণা যেসব দরবারে পূর্ণত্ব লাভ করে সেসব স্বচক্ষে দেখে কতটা আবেগাপ্লুত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন। তিন শতাধিক বছরের মহাপ্রতাপান্বিত মোগল সাম্রাজ্য প্রকৃতির নিয়মেই বিলুপ্ত আর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সর্বশেষ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর। হিন্দুস্থানের শাহানশাহকে পায়ে শেকল পরিয়ে তাঁরই পিতৃপুরুষের হাতে নির্মিত লাল কেল্লার বিচারমঞ্চে

হাজির করা হয়। বিচারে তাঁকে নির্বাসনের সাজা দেওয়া হয়। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফর (১৭৭৫-১৮৬২ খ্রি.) নির্বাসনভূমি রেঙ্গুনেই দেহত্যাগ করেন। তাঁর কবরও সেখানেই রচিত হয়।

মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফর একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। 'যাফর' তাঁর কবি নাম। জীবনের শেষলগ্নে ইংরেজদের হাতে সীমাহীন লাঞ্ছিত হওয়ার ফলে তিনি প্রায় নির্বাক হয়ে যান। দুঃখের যেসব কবিতা তাঁর শেষজীবনে রচনা করতেন সেগুলো আজও উর্দু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হয়। বাপ-দাদার সাম্রাজ্য হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার পর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অজ্ঞাতবাসে মৃত্যুবরণ যে কত বেদনার তা কেবল আরেকজন হতভাগ্য শাহানশাহের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

তাঁর কবিতায় এ মর্মে একটি পঙ্‌ক্তি আছে :

'ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও আমায় কেউ যেন উৎপীড়ন করছে—

কেউ যেন আমার কবরের চিহ্নটুকুও মাটিতে মিশিয়ে একাকার করে দিচ্ছে।'

মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এক কবিতায় তিনি বলেছিলেন :

'কতই না হতভাগা তুমি হে যাফর, স্বদেশের বুকে পরিজনের সান্নিধ্যে কবরের দুগজ মাটিও তোমার কপালে জুটল না।'

বেশ কয়বছর আগে শুনেছিলাম, কলকাতার মেটিয়া বুরুজ এলাকায় মোগল রাজবংশের অধঃপুরুষ কেউ একজন বসত করতেন। এবং তিনি সরকারি এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আধুনিক ভারতে এটি কোনো সংবাদ নয়।

ঢাকার জনৈক প্রবীণ একদিন গল্পচ্ছলে আমাকে বললেন, 'যৌবনে তিনি দিল্লি ভ্রমণে গেলে স্থানীয় গাইডেরা তাঁকে লাল কেল্লার অদূরবর্তী এক বস্তিতে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য মোগল বাদশাহদের বংশধর এ বস্তিতে অনেকেই থাকেন। দর্শনার্থীদের তাঁরা সাক্ষাৎও দেন। যদি দেখা হয়ে যায়!'

একটি ঘরের সামনে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে গাইড আবেদন জানায়, 'সুদূর ঢাকা থেকে জনৈক দর্শনার্থী এসেছেন, যদি তাঁরা কেউ দর্শন দান করেন!' তখন বয়োবৃদ্ধ এক ব্যক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঢাকার এ প্রবীণ তাঁকে সালাম করলে তিনি কাঁধের গামছাটি মাটিতে বিছিয়ে চারজানু হয়ে বসলেন এবং বললেন, 'ওয়া আলাইকুম সালাম'। এরপর ধীর পায়ে ফিরে গেলেন ঘরে। ইনি ফিরে যাওয়ার পর পর্যটক ব্যক্তিটি ইচ্ছে করলেন তাঁকে কিছু হাদিয়া দিতে। বিষয়টি গাইডকে বললে সে জানাল, 'এখন আর টাকা দেওয়ার উপায় নেই। বৃদ্ধ শাহজাদা সাহেব যখন গামছায় তশরীফ রেখেছিলেন তখন হাদিয়াটুকু তাঁর গামছার এক প্রান্তে বা-আদব বা-মোলাহাযা রেখে দিলে হয়তো তিনি তা গ্রহণ করতেন কিন্তু এখন আর এ টাকা তাঁকে কোনোক্রমেই দেয়া যাবে না।'

আবাল্য অনুসন্ধিৎসার টানেই হয়তো শত শত বছরের শাসন-ঐতিহ্য নিয়ে বেড়ে ওঠা শেষ মোগল সম্রাট পরিবারের ওপর সিপাহী বিপ্লবোত্তর কালে ইংরেজ শাসকদের অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং এ পরিবারের সদস্যদের ভাগ্য বিপর্যয়ের ওপর রচিত ঐতিহাসিক কিছু পুস্তক আমার সংগ্রহে আসে। একসময় বাংলাভাষী পাঠকদের জন্যে এর কিছু অংশের ভাষান্তরও করা হয়। আশা করি এ দেশের ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্যের অঙ্গনে এ পুস্তক স্থায়ী আসন করে নেবে।

বিনীত
উবায়দুর রহমান খান নদভী

মতিঝিল, ঢাকা
২৩ জুন, ২০০০

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, বহুবছর পর বইটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হলো। নানা কারণে কিছুকাল লেখালেখি ও প্রকাশনা থেকে খানিকটা দূরে সরে থাকতে হয়। রাহনুমার আগ্রহ ও সাথীদের উৎসাহে নতুন করে পুরোনো এসব বই আবার প্রকাশিত হলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সব ধরনের কল্যাণে ভরপুর করে দিন।

বিনীত

উবায়দুর রহমান খান নদভী

মতিঝিল, ঢাকা

১০ রমযান, ১৪৩৭

সূচিপত্র

- কুলসুম যমানী বেগম–১৫
- গুলবানু–২৪
- শাহজাদী–২৯
- নারগিস নযর–৩৮
- মাহ্ জামাল–৪৭
- সাকীনা খানম–৫৭
- সবুজ পোশাকের বীরাঙ্গনা–৬৫
- বাহাদুর শাহ্ যাফর–৬৮
- মির্জা দিলদার শাহ–৭১
- মির্জা কমর সুলতান–৭৩
- শেষ সম্রাজ্ঞী
  পাকিজা সুলতান বেগম ও
  তাহেরা সুলতান বেগম–৭৫

কুলসুম যমানী বেগম

এক নিরুপায় দরবেশ-নারীর বিপন্ন অবস্থার সত্য কাহিনি এটি, যাঁর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল যুগবদলের প্রবল ঝাপটা। তাঁর নাম ছিল কুলসুম যমানী বেগম। ইনি ছিলেন দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফরের[১] আদুরে কন্যা।

কয়েক বছর হলো তিনি মারা গেছেন। কয়েকবার আমি নিজে শাহজাদী সাহেবার মুখে তাঁর অবস্থার কথা শুনেছি। কেননা, আমাদের হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে ইলাহীর প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ভক্তি। সেজন্য প্রায়ই তিনি দরগাহে আসতেন এবং আমি করুণ কাহিনি শোনার সুযোগ পেয়ে যেতাম। নিচে যতগুলো ঘটনা বলা হয়েছে তা হয় স্বয়ং তিনি নয়তো তাঁর কন্যা যীনাত যমানী বেগম আমাকে শুনিয়েছেন। যীনাত যমানী বেগম এখনো জীবিত এবং পণ্ডিতের গলিতে থাকেন। ঘটনাগুলো এ রকমের :

যে সময় আমার পূর্বপুরুষের বাদশাহী শেষ হলো এবং সিংহাসন মুকুট লুণ্ঠিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল, সে সময় দিল্লির লাল কেল্লায় কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেছে। চারিদিকে কেউ কিছু খায়নি। যীনাত আমার কোলে, দেড় বছরের শিশু দুধের জন্য কাঁদছিল। ভাবনা-চিন্তায় না আমার বুকে দুধ ছিল, না কোনো ধাইয়ের। আমরা সবাই যখন এমনই বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলাম, জিল্লে সোবহানীর (মোগল যুগে বাদশাহকে এই উপাধিতেই সম্বোধন করা হতো। অর্থ : মহান আল্লাহর আশিসপূর্ণ ছায়া) বিশেষ খোজা আমাদের ডাকতে এল।

১. খাজা হাসান নিজামী তার মূল উর্দু বইয়ে লিখেছেন, 'আবু যাফর বাহাদুর শাহ।' নামটি 'বাহাদুর শাহ যাফর' রূপেই প্রসিদ্ধ বলে এ তর্জমায় আমরা এভাবেই লিখলাম। –অনুবাদক।

মধ্যরাত্রি, নিস্তব্ধতার পরিবেশ, গোলাগুলির নির্ঘোষে বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে কিন্তু বাদশাহর হুকুম পাওয়ামাত্রই আমরা হাজিরি দিতে পৌঁছে গেলাম। হুজুর তখন বসে। হাতে তসবীহ। যখন আমি সামনে গিয়ে মাথা নত করে তিনবার সালাম আরয করলাম, হুজুর আমাকে বড় স্নেহে কাছে ডাকলেন ও বললেন, 'কুলসুম, তোমাকে আমি খোদার হাতে সঁপে দিচ্ছি। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে এক্ষুণি কোথাও বেরিয়ে পড়ো। আমিও যাব। মন তো চায় না যে, এই শেষ সময় তোমাদের চোখের আড়াল করি কিন্তু সঙ্গে রাখলে তোমার ক্ষতি হওয়ার ভয় রয়েছে। আলাদা থাকলে হয়তো খোদা তোমাদের কোনো ভালো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।'

এই বলে হুজুর তাঁর হস্ত মোবারক যা কাঁপুনিরোগে কাঁপছিল ওপরে ওঠান ও অনেকক্ষণ ধরে উঁচু গলায় আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকেন :

'খোদা তাআলা এই বেওয়ারিস বাচ্চাদের তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি। রাজমহলে যারা বাস করত, তারা আজ জনহীন জঙ্গলে যাচ্ছে। দুনিয়াতে এদের সাহায্য করার কেউ নেই। তৈমুর নামের মর্যাদা রক্ষা করো এবং এই নিরাশ্রয় নারীদের ইজ্জত বাঁচিয়ো। হে পরোয়ারদেগার, শুধু এই নয়, বরঞ্চ সমস্ত হিন্দুস্তানের তাবৎ হিন্দু-মুসলমান আমার সন্তান এবং সবারই আজ বিপদ। আমি অপয়া, আমার কর্মদোষে এদের মানহানি কোরো না বরং সবাইকে কষ্ট-হয়রানি থেকে মুক্তি দাও।'

তারপর তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। যীনাতকে আদর করলেন ও আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীনকে কিছু গয়নাগাঁটি দিয়ে নূরমহল সাহেবাকে আমাদের পথের সঙ্গিনী করে দিলেন। নূরমহল ছিলেন হুজুরের বেগম।

শেষরাতে কেল্লা থেকে বের হয় আমাদের কাফেলা। দুজন পুরুষ ও তিন জন মহিলা। পুরুষদের মধ্যে একজন আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীন এবং অন্যজন মির্জা উমর সুলতান—যিনি ছিলেন বাদশার ভগ্নীপতি। মেয়েদের মধ্যে এক আমি, দ্বিতীয় নবাব নূরমহল এবং তৃতীয় জন বাদশাহর বেয়াইন হাফিজ সুলতান। যে সময় আমরা ঘোড়াগাড়িতে বসি, সেটা রাত্রির শেষ প্রহর। সমস্ত তারাই অদৃশ্য, শুধু শুকতারা ঝিলমিল করছিল। আমরা যখন

আমাদের সাজানো সংসার ও সুলতানী মহলের দিকে শেষবার তাকালাম, বুক টনটনিয়ে উঠল। আমাদের চোখ ফেটে পানি এল। নবাব মহলের চোখও অশ্রুসজল। শুকতারার ঝিলিক ধরা দিয়েছে নূরমহলের চোখে।

শেষ পর্যন্ত লালকেল্লা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে কোরালি গ্রামে পৌঁছলাম এবং সেখানে আমাদের গাড়িচালকের বাড়িতে নামলাম। খেতে পেলাম বাজরার রুটি ও ঘোল। সে সময় খিদের চোটে তাও বিরিয়ানি পোলাওর চেয়ে বেশি স্বাদ লাগল। একদিন কেটে গেল শান্তিতে। কিন্তু পরের দিন জাঠ ও গুজররা জড়ো হয়ে কোরালি লুঠ করতে চড়াও হলো। তাদের সঙ্গে শত শত মেয়েলোকও ছিল। তারা ডাইনিদের মতো আমাদের ছেঁকে ধরল। সমস্ত গয়নাগাঁটি ও কাপড়-চোপড় ওরা খুলে নিল। যে সময় এই দুর্গন্ধময় পঁচা মেয়েলোকগুলো তাদের নোংরা হাত দিয়ে আমাদের গলা খুবলে খুবলে দিচ্ছিল, তখন তাদের ঘাগরা থেকে এমন বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছিল যে আমাদের দম আটকে আটকে যাচ্ছিল। এই লুঠের পরে আমাদের কাছে এতটুকুও কিছু অবশিষ্ট রইল না যাতে একবেলার খাবার জোটে। আমরা তখন বিহ্বল, না জানি এবার কী হয়! তেষ্টায় যীনাত কাঁদছিল। সামনে দিয়ে একজন কৃষক যাচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে তাকে ডাক দিলাম, 'ভাই, এই বাচ্চাটাকে একটু পানি এনে দাও।' কৃষকটি তক্ষুণি গিয়ে মাটির পাত্রে পানি নিয়ে এল। বলল, 'আজ থেকে তুই আমার বোন ও আমি তোর ভাই।' এই কৃষক কোরালি গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। তার নাম ছিল বস্তি। সে তার গরুর গাড়ি জুতে আমাদের সবাইকে বসিয়ে বলে, 'যেখানে বলবে সেখানে পৌঁছে দেব।' আমরা বলি, 'মীরাট জেলায় অজারাতে মীর ফয়েজ আলী শাহী হাকিম থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের বেশ ভালো সম্পর্ক। সেখানে নিয়ে চলো।' বস্তি আমাদের অজারাতে নিয়ে গেল। কিন্তু মীর ফয়েজ আলী চূড়ান্ত খারাপ ব্যবহার করলেন। সোজা কানের ওপর হাত রেখে বললেন, তোমাদের এখানে থাকতে দিয়ে আমার ঘর-গেরস্তালি নষ্ট হতে দিতে পারি না।

(মীর ফয়েজ আলীর ছেলে যখন এই বই পড়েন, তখন বলেন যে বেগম সাহেবার বক্তব্য ঠিক নয়। মীর ফয়েজ আলী তাদের সবাইকে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন।)

ঘন নিরাশায় ভরা সময় ছিল সেটা। একে তো ভয়, পেছন থেকে ইংরেজ সৈন্য এল বুঝি। তার ওপর আমাদের অবস্থা এতই খারাপ যে, সবাই বিরূপ। যারা আমাদের চোখের ইশারায় চলত আর সবসময় চৌকস থাকত যে আমাদের হুকুম পাওয়ামাত্রই যেন তা তামিল হয়, তারাই আজ আমাদের মুখদর্শন করতে চায় না। কৃষক বস্তিকে ধন্যবাদ যে সে তার ধর্ম-বোনকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছে। নিরুপায় আমরা অজারা থেকে রওনা হলাম ও হায়দ্রাবাদের পথ ধরলাম। মেয়েরা বস্তির গরুর গাড়িতে ও পুরুষরা পায়ে হেঁটে। তৃতীয় দিন পৌঁছলাম এক নদীর তীরে, যেখানে কোয়লের নবাবের বাহিনী শিবির গেড়ে অবস্থান করছিল। তারা যখন শুনল, আমরা শাহী খানদানের লোক, তখন তারা খুব খাতিরযত্ন করল আর হাতিতে বসিয়ে নদী পার করে দিয়ে গেল। আমরা নদীর অন্য পারে নামামাত্র সামনে থেকে সৈন্য এসে পৌঁছল ও নবাবের সৈন্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেঁধে গেল।

আমার স্বামী ও মির্জা উমর সুলতান চাইছিলেন নবাবের সৈন্যে যোগদান করে যুদ্ধ করতে। কিন্তু রিসালদার বলে পাঠালেন, 'আপনারা মেয়েদের নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান। আমরা যেমন করে হোক মোকাবিলা করব। সামনে ছিল খেত আর তাতে পাকা ফসল। আমরা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। জানি না সেই নিষ্ঠুররা দেখে ফেলেছিল কি না—হয়তো বা হঠাৎই গুলি এসে লাগল। যাই হোক, একটা গোলা খেতের মধ্যে এসে পড়ায় সমস্ত খেত দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে পালাই আমরা। কিন্তু হায়! কী বিপদ, আমরা পালাতেও জানি না। ঘাসে পা জড়িয়ে যাওয়ায় বারেবারে আছাড় খেয়ে পড়ি। মাথা ঢাকবার ওড়না ওখানেই পড়ে রইল। অনাবৃত মাথায়, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাওয়া অবস্থায় অনেক কষ্টে খেত থেকে বের হয়ে এলাম। আমার ও নবাব মহলের পা রক্তাক্ত। তেষ্টায় মুখ থেকে জিভ বেরিয়ে আসছে। যীনাত বারে বারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। পুরুষরা আমাদের সামলাচ্ছেন কিন্তু আমাদের সামলানো কি চাট্টিখানি কথা!

খেত থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে নবাব নূরমহল মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। যীনাতকে বুকের মধ্যে নিয়ে আমি আমার

স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম আর মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ আমরা যাই কোথায়। কোনো ভরসাই কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভাগ্য এমনই পাল্টাল যে শাহী মহল থেকে ফকিরীতে নেমে এলাম। কিন্তু ফকিররা তো শান্তি ও স্বস্তিতে থাকে। আমাদের ভাগ্যে তাও নেই।

সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। বস্তি গিয়ে নদী থেকে পানি আনে। আমরা পানি খেলাম ও নবাব নূরমহলের মুখের ওপর পানির ছিট দেয়া হলো। নূরমহল কাঁদতে শুরু করেন। বলেন, এখুনি স্বপ্নে তোমার বাবা জিল্লে সোবহানীকে দেখলাম। তিনি শেকলে বাঁধা দাঁড়িয়ে আছেন আর বলছেন :

'আজ আমাদের মতো গরিবের জন্য কাঁটায় ভরা ধুলোয় বিছানা মখমলের ফরশ থেকে ঢের ভালো। নূরমহল, ব্যাকুল হোয়ো না। সাহসে বুক বেঁধে কাজ করো। নসীবের লিখন, বার্ধক্যে এইসব কঠোরতা সহ্য করো। আমার কুলসুমকে একটু দেখিয়ে দাও। জেলখানায় যাওয়ার আগে তাকে একবার দেখতে চাই।'

বাদশাহর এই সব কথা শুনে আমার মুখ থেকে 'হায়' বেরিয়ে এল আর ঘুম ভেঙে গেল। কুলসুম, সত্যি কি বাদশাহকে শেকলে বেঁধেছে? সত্যিই কি ওরা তাঁকে কয়েদীদের মতো জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে? মির্জা উমর সুলতান জবাব দিলেন, 'এ তোমার নিছক খেয়াল। বাদশাহরা বাদশাহদের সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করে না। তুমি ভয় পেয়ো না। তিনি বহাল তবিয়তেই আছেন।' বাদশাহর বেয়াইন হাফিজ সুলতান বললেন, 'এই মড়া ফিরিঙ্গিরা বাদশাহর মূল্য কী ছাই বুঝবে? তারা নিজেরাই তাদের সুলতানের মাথা কেটে ষোলো আনায় বিক্রি করে (রৌপ্যমুদ্রার প্রতি ইশারা, যাতে রাজার মাথার ছাপ থাকে- হাসান নিমাজী।) নূরমহল ফুফু, তুমি তো তাঁকে শেকল পরা অবস্থায় দেখেছ। আমি বলি, এই বেনে ফেরিঅলারা এর চেয়েও বেশি খারাপ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীন আশ্বাসের কথা বলে সবাইকে শান্ত করেন।

এরই মধ্যে বস্তি নৌকোর ওপর গাড়ি চাপিয়ে এপারে নিয়ে আসে ও আমরা তাতে বসে রওনা হই। অনতিদূর যেতেই সন্ধ্যে নেমে আসে এবং আমাদের গাড়ি এক গাঁয়ে গিয়ে থামে। সেই গ্রামে মুসলমান রাজপুতদের বসতি। গাঁয়ের মোড়ল আমাদের জন্য একটি কুঁড়েঘর খালি করিয়ে দিল। তাতে শুকনো ঘাস ও খড়ের বিছানা পাতা। যাকে ওরা পিয়াল বা পরাল বলে সেই ঘাসের ওপরেই তারা ঘুমোয়। আমাদেরও বেশ খাতির করে (যা তাদের হিসেবে বেশ উঁচুদরের খাতির) তারা এই নরম বিছানা দিল।

আমার প্রাণ তো এই জঞ্জাল দেখে আইঢাই করতে থাকে। কিন্তু সে সময় করাই বা কী যায় অথবা কীইবা হতে পারত। বাধ্য হয়ে তার ওপরেই শুয়ে পড়ি। সারাদিনের ধকল ও ক্লান্তির পর নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত হওয়ার দরুন চোখে ঘুম নেমে আসে।

মাঝরাতে হঠাৎই সবার ঘুম ভেঙে গেল। ঘাসের শীষগুলো ছুঁচের মতো বিঁধছিল গায়ে। আর যেখানে-সেখানে ডাঁশের কামড়। সে সময় কী যে অস্বস্তি হচ্ছিল খোদাই জানেন। মখমলের বালিশ ও নরম তুলতুলে রেশমের বিছানার অভ্যেস আমাদের, তাই যা কিছু কষ্ট। নইলে আমাদের মতোই এ গ্রামে অন্য লোকেরা রয়েছে, যারা এই ঘাসের ওপরেই গভীর ঘুমে অচেতন। অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক থেকে শেয়াল ডাকে আর আমার বুক ভয়ে কাঁপে। ভাগ্য পালটাতে দেরি হয় না। কে ভাবতে পারত যে, একদিন শাহানশাহে হিন্দের ছেলেপিলেরা এই ভাবে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এইভাবে পদে পদে ভাগ্য বিড়ম্বনার তামাশা দেখতে দেখতে হায়দ্রাবাদ পৌঁছে গেলাম ও সীতারাম পেঠেতে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। জব্বলপুরে আমার স্বামী একটি রত্নজড়িত আংটি বিক্রি করে দেন যেটি লুটপাট থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তাই দিয়ে পথের খরচ চলে আর এখানেও কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত যা কিছু কাছে ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এবার ভাবনা পেট ভরাবার কী ব্যবস্থা করা যায়। আমার স্বামী বেশ উঁচুদরের খোশনবীস তথা নন্দন লিপিকার ছিলেন। তিনি লতা-পাতা এঁকে সুন্দর লিখনে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের গুণগান লিখলেন এবং